#আমি পদ্মজা পর্ব ৪

দিনটাকে পদ্মজার অলক্ষুণে মনে হচ্ছে। সকালে উঠে দেখল, লাল মুরগিটার একটা বাচ্চা নেই। নিশ্চয় শিয়ালের কারবার। রাতে মুরগি খোপের দরজা লাগানো হয়নি। আর এখন আবিষ্কার করল, দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে না। ঘড়িটা রাজধানী থেকে হানি খালামণি দিয়েছিলেন। গ্রামে খুব কম লোকই হাত ঘড়ি পরে। দেয়াল ঘড়ি হাতেগুণা দুই-তিনজনের বাড়িতে আছে। পদ্মজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময়ের আন্দাজ করার চেষ্টা করল।

পূর্ণা, প্রেমা দুপুরে খেয়েই ঘুম দিয়েছে। পদ্মজা মায়ের রুমে উঁকি দিল। হেমলতা মনোযোগ দিয়ে সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন। আটপাড়ায় একমাত্র হেমলতাই সেলাই কাজ করেন। প্রতিটি ঘরের কারো না কারো পরনে তার সেলাই করা কাপড় আছেই।

‘লুকিয়ে দেখছিস কেন? ঘরে আয়।’
হেমলতার কথায় পদ্মজা লজ্জা পেল।
‘না আম্মা। কাজ আছে। ‘
‘পানি দিয়ে যা।’
হেমলতা জগ বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা

জগ হাতে নিয়ে বলল, ‘আম্মা,ছদকা কোন মুরগিটা দেব?’

হেমলতা গতকাল স্বপ্নে দেখেছেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। তাই তিনি ছদকা দিবেন বলে মনস্থির করেছেন। সকালেই পদ্মজাকে মনের কথা জানালেন।

‘ সাদা মোরগটা দিয়ে দিস। মুন্না কি আসছে?’

‘না। প্রতিদিন বিকেলবেলা তো পানি নিতে আসে। কিছুক্ষণ পরই আসবে।’

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। পদ্মজা কলপাড় থেকে পানি নিয়ে আসে। আছরের আযানের সাথে সাথে

মুন্না আসল। গ্রামে সচ্ছল পরিবার নেই বললেই চলে। হাতে গোনা কয়েকটা পরিবারে সচ্ছলতা আছে। হেমলতার পরিবারটা টিকে আছে, হেমলতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্য। পুরো আটপাড়ায় টিউবওয়েল মাত্র পাঁচটা। পদ্মজাদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে প্রতিদিন অনেকেই আসে। তার মধ্যে নিয়মিত একজন মুন্না। দশ বছরের একটা ছেলে। মা নেই। বাবা পঙ্গু। সদরে বসে ভিক্ষা করে। পদ্মজা মোরগ নিয়ে কলপাড়ে এসে দেখে মুন্না নেই। একটু সামনে হেঁটে এসে ঘাটে মুন্নাকে দেখতে পেল। ডাকল,'মুন্না।'

মুন্না ফিরে তাকায়। পদ্মজার হাতে সাদা মোরগ দেখে মুন্না খুব খুশি হয়। পদ্মজা না বললেও বুঝে যায়, ছদকা পাবে আজ। মুন্না এগিয়ে আসল। দাঁত কেলিয়ে হাসল।

‘হাসিস কেন? নে মোরগ। তোর আব্বাকে নিয়ে খাবি।’

মুন্না যে খুব খুশি হয় তা দেখেই বোঝা গেল। খুশিতে গদগদ হয়ে মোরগটাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজার ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তিতে প্রশান্তির হাসিতে মেতে উঠল। কী সুন্দর মুন্নার হাসি!
পদ্মজা বলল, ‘খুব খুশি?’
‘হ।’

‘দোয়া করবি আমরা যেন ভাল থাকি।’
‘করবাম আপা।’
‘আচার খাবি মুন্না?’
‘হ,খাইবাম।’

পদ্মজা আবার হাসল। মুন্না পেটুক। খাওয়ার কথা শুনলেই চোখ চকচক করে উঠে। পদ্মজা আচার নিয়ে আসে। মুন্নার সাথে বসে আরাম করে খায়। মুন্না একটু একটু করে খেতে খেতে বলল, ‘আপা, তুমি খুব ভালা।’
‘তাই?’
‘হ।বড় হইয়া তোমারে বিয়া করবাম আমি।’

পদ্মজা বিষম খেল। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ শুনল নাকি। বিয়ে তার কাছে খুব লজ্জাজনক শব্দ। বিয়ে নামটা শুনলেই লজ্জায় লাল টুকটুকে হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে মুন্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ের কথা কোথায় শিখলি?'

' আব্বা কইছে।'

' আর বলবি না এসব। যা,বাড়িত যা।'

পদ্মজা তড়িঘড়ি করে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, হেমলতা রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ থাকে না। হারিকেন জ্বালিয়ে রান্না

করতে হয়। প্রতিদিন ঘরে একটা হারিকেন আর রান্নাঘরে একটা হারিকেন জ্বালানো অনেক খরচের ব্যাপার। তাই তিনি বিকেলে রাতের রান্না সেড়ে ফেলেন।

‘আম্মা আমি রাঁধি?’

‘লাগবে না। সাহায্য কর শুধু।’

পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখল, কী কাজ করা যায়। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। হেমলতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, ‘ লাউ নিয়ে আয়।’

‘ছিড়ে আনব? না লাহাড়ি ঘরে আছে?’

‘লাহাড়ি ঘরে নাই।’

পদ্মজা মায়ের আদেশ পেয়ে যেন চাঁদ পেয়েছে। এমন ভাব ধরে দ্রুত ছুটে যায় লাউ আনতে। লাউ,বরবটি, ঢেঁড়স, কাঁকরোল, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, ঝিঙা.. ইত্যাদি, ইত্যাদি সব রকমের সবজির মেলা বাড়ির চারপাশ ঘিরে। পদ্মজা সাবধানে ঘাসের উপর দিয়ে লাউ গাছের দিকে এগোয়। বর্ষাকাল হওয়াতে জোঁকের উপদ্রব বেড়েছে। জোঁকের ভয় অবশ্য নেই তার।

হেমলতা পদ্মজার যাওয়া পানে ঝিম মেরে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটাকে দেখলে তার মন বিষণ্নতায় ভরে উঠে। পদ্মজার চুল

দেখলে মনে হয়, এই সুন্দর ঘন কালো রেশমী চুল পদ্মজার একেকটা কাল রাত। পদ্মজার ছিমছাম গড়নের দুধে আলতা দেহের অবয়ব দেখলে মনে হয়, এই দেহ পদ্মজার যন্ত্রণা। এই দেহ ধ্বংস হবে। পদ্মজার ওষ্ঠদ্বয়ের নিম্নে স্থির হয়ে থাকা কালো সূক্ষ্ম তিল দেখলে মনে হয়, এই তিল পদ্মজার এক জীবনের কান্নার কারণ। হেমলতা পদ্মজার রূপের বাহার নিতে পারেন না। কেন কৃষ্ণকলির ঘরে ভুবন মোহিনী রূপসীর জন্ম হলো! জন্ম,মৃত্যু, বিয়ে কারো হাতে থাকে না। যদি থাকতো, হেমলতা মোর্শেদকে বিয়ে করতেন না এবং পদ্মজার মতো

রূপসীর জন্ম দিতেন না। আল্লাহর কাছে,রূপসী মেয়ে ভুলেও চাইতেন না। হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

____

আজ শুক্রবার। স্কুল নেই। ফজরের নামায পড়ে তিন বোন পড়তে বসেছে। প্রেমা নামায পড়তে চায় না। ঘুমাতে চায়। হেমলতার মারের ভয়ে নামায পড়ে। সে ঝিমুচ্ছে আর পড়ছে। তা দেখে পদ্মজা আর পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসছে। হেমলতা বিরক্ত হোন। প্রেমার তো পড়া হচ্ছেই না। সেই সাথে পদ্মজা, পূর্ণার মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। তিনি

কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন,

‘প্রেমা,ঘুমাচ্ছিস কেন? ঠিক হয়ে পড়।’

প্রেমা সচকিত হলো। চট করে চোখ খুলে, ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়া শুরু করল। হেমলতা কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক গলায় বললেন, ‘পড়তে হবে না। ঘরে গিয়ে ঘুমা।’

প্রেমা একটু অবাক হয়। পরেই খুশি হয়ে ছুটে যায় ঘরে। পূর্ণা মুখ ভার করে ফেলল। তার ও তো পড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, মা কখনো তাকে ছাড় দেন না। হয়তো ছোটবেলা ছাড় দিতেন। মনে নেই। সে আবার খুব দ্রুত সব ভুলে যায়। ব্রেন ভাল প্রেমার। যা

পড়ে মনে থাকে। পূর্ণা খুব দ্রুত ভুলে যায়। পদ্মজার সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু রূপ বাদে।

সূর্য উঠার সাথে সাথে মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকেন। হাতে ঝাকি জাল আর বড়শি। কাঁধে পাটের ব্যাগ ঝুলানো। ভোরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মোর্শেদ বাড়ি ফিরলে পূর্ণা আর প্রেমা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। মাছ খেতে পারে অনেক। অর্থের জন্য হেমলতা খুব কম মাছ আনেন। মোর্শেদ বাড়িতে যতদিন থাকেন ততদিন মাছের অভাব হয় না। মোর্শেদ বলার পূর্বেই পূর্ণা ও প্রেমা গামলা নিয়ে ছুটে আসে উঠানে।

মোর্শেদ কাঁধের ব্যাগ উল্টে ধরেন গামলার উপর। পুঁটি, ট্যাংড়া, পাবদা,চিংড়ি মাছের ছড়াছড়ি। হেমলতা ভারী খুশি হোন। পদ্মজা লতা দিয়ে চিংড়ি খেতে খুব পছন্দ করে। আর প্রেমা, পূর্ণা পছন্দ করে পাবদা মাছের ভুনা। মেয়েগুলো খুব খুশি হয়েছে মাছ দেখে। তিনি জানেন, মোর্শেদ বাড়ি থেকে বের হতেই পদ্মজা ছুটে যাবে বাড়ির পিছনে লতা আনতে।

‘হুনো, লতা। আমার আম্মারারে পাবদা ভুনা কইরা দিবা। সবজি টবজি দিয়া রাঁনবা না।’

‘আব্বা,আপনি বাড়িতে থাকবেন?

তাইলে তো প্রতিদিনই মাছ খেতে পারি।'

মোর্শেদ আড়চোখে পদ্মজাকে একবার দেখে তীক্ষ্ণ চোখে হেমলতার দিকে তাকান। এরপর পূর্ণাকে জবাব দিলেন, 'কোনোরহম অশান্তি না হইলে তো থাকবামই।'

গামছা নিয়ে তিনি কলপাড়ে চলে যান। পদ্মজার মুখটা ছোট হয়ে যায়। প্রতিবার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে মোর্শেদ পদ্মজাকে রাগে কটুকথা শোনান। তখন, হেমলতা মোর্শেদকে শাসান। ফলস্বরূপ মোর্শেদ বাড়ি ছাড়েন।

‘মোর্শেদ নাকি? বাড়ি ফিরলা কোনদিন?’

মোর্শেদ গোসল সেড়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। সকালের মিষ্টি রোদ। ঘাড় ঘুরিয়ে রশিদ ঘটককে দেখে হাসলেন।

‘আরে মিয়া চাচা। আহেন, আহেন। পূর্ণারে চেয়ার আইননা দে। খবর কী?’

পূর্ণা চেয়ার এনে দিল। রশিদ এক দলা থুথু উঠানে ফেলে চেয়ারে বসলেন আরাম করে। প্রেমাকে উঠানে খেলতে দেখে ফরমায়েশ দিলেন, ‘এই মাইয়া যা পানি লইয়া আয়। অনেকক্ষণ ধইরা দমডা আটকাইয়া আছে।’

প্রেমা পানি নিয়ে আসে। রশিদ পানি খেয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'খবর তো ভালাই। বাবা ছেড়িডারে কী বিয়া দিবা না?'

'দুই বছর যাক। পড়তাছে যহন,মেট্রিকটা পাশ করুক। কী কন?'

'মেজোডা না। বড়ডা। তোমার বউ তো মরিচের লাহান। কোনোবায়ও রাজি অয় না। তুমি বোঝাওছেন। পাত্র খাঁটি হীরা। বাপ-দাদার জমিদারি আছে। '

মোর্শেদ আড়চোখে হেমলতা এবং পদ্মজার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। নেই তারা। তিনি জানেন, পদ্মজার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি

তিনি করতে পারবেন না। হেমলতা তা হতে দিবেন না। এসব তো আর বাইরের মানুষের সামনে বলা যায় না। মোর্শেদ রশিদ ঘটককে নরম গলায় বললেন, ‘থাকুক না পড়ুক। মায়ে যহন চায় ছেড়ি পড়ুক। তাইলে পড়ুক।’

রশিদ নিরাশ হলেন। ভেবেছিলেন, মোর্শেদ রাজি হবে। তিনি মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। এরপর বড় অসুখে পড়লেন। তাই মোর্শেদ বাড়ি ফিরেছে শুনেও আসতে পারেননি। আজ একটু আরামবোধ হতেই ছুটে এসেছেন অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু মোর্শেদের জবানবন্দিতে তিনি আশাহত হলেন।

কটমটে গলায় বললেন, ‘যুবতী ঘরে রাহন ভালা না। যহন বংশে কালি পড়ব তহন বুঝবা। হুনো মোর্শেদ, এই বয়সী মাইয়াদের স্বভাব চরিত্র বেশিদিন ভালা থাহে না৷ পাপ কাম এদের চারপাশে ঘুরঘুর কর। বেলা থাকতে জামাই ধরাইয়া দেওন লাগে। বুঝছোনি? তোমার বউরে বোঝাও।’

রশিদ, পাত্রের অনেক প্রশংসা করলেন। জমিজমা, বাড়িঘর সবকিছুর বাড়াবাড়ি রকমের বর্ণনা দিলেন। ফলে,মোর্শেদের মস্তিষ্ক কাজ করা শুরু করল। রশিদ ঘটক যেতেই তিনি হেমলতার পাশে গিয়ে বসেন।

ইনিয়েবিনিয়ে পদ্মজার বিয়ের কথা তুলেন। হেমলতা সাফ নাকচ করে দেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে দেন, পদ্মজার বিয়ে তিনি দিচ্ছেন না। আর মোর্শেদকে পদ্মজার ব্যাপারে নাক গলাতে না করেছেন। শেষ কথাটা বেশ কঠিন করেই বলেন, ‘আগে বাপ হও। পরে বাপের কাজ করতে আসবা।’

মোর্শেদের তিরিক্ষি মেজাজ। তিনি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। রগে রগে রাগ টগবগ করছে। পদ্মজাকে বারান্দায় দেখে তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, ‘ছেড়ি যহন রূপ দিয়া নটি

হইব। তহন আমার ঠ্যাংও পাইবা না। এই ছেড়ি মজা বুঝাইবো। ‘

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হেমলতা রান্নাঘর থেকে বের হলেন মোর্শেদকে কিছু কঠিন কথা শোনাতে। পদ্মজা তখন দৌড়ে আসে। হেমলতার হাতে ধরে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। মোর্শেদ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তারও খুব ভাল লাগে। পূর্ণা,প্রেমা কত খুশি হয়। বাড়িটা পরিপূর্ণ লাগে। সে চায় না তার বাবা ঝগড়া করে রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাক। হেমলতা রাগে এক ঝটকায় মেয়ের হাত সরিয়ে দেন। তার সহ্য হয় না মোর্শেদকে। মানুষের

কথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বদমেজাজি একজন মানুষ মোর্শেদ। ভালটা কখনো বুঝে না। মানুষের কথায় নাচে। সারাক্ষণ মস্তিষ্কে একটা বাক্যেরই পূজা করে, 'মানুষ কী বলবে? '

____

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মাথার উপর বৃষ্টি নিয়ে মোর্শেদ বাড়ি ফেরেন। মুখ দেখে বোঝা গেল, তিনি খুব খুশি।
হেমলতাকে ডেকে বললেন, 'এক মাসের লাইগগা ঘরটা ছাইড়া লাহাড়ি ঘরে উইঠ্ঠা পড়।'
'কীসের দরকারের জন্য?'
'শুটিং করার লাইগগা মাতব্বর বাড়ির

যারা আইছে, তারার বুলি আমরার বাড়ি পছন্দ অইছে। বিরাট অংকের টেকা দিব কইছে। আমিও কথা দিয়া আইছি। কাইলই উঠতে কইয়া আইছি।’

হেমলতা বিরক্ত হতে গিয়েও পারলেন না। সত্যি অর্থের খুব দরকার। পদ্মজার সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। কত খরচ। কলেজে পড়াতে ঢাকা পাঠাতে হবে। তিনি মোর্শেদকে বললেন, ‘টাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে বলবা। নয়তো জায়গা হবে না।’
‘আরে..বলামনে। এখন সব গুছাইয়ালাও ।’

পূর্ণা আড়াল থেকে সবটা শুনেছে। সাত দিন হয়েছে লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী এই গ্রামে এসেছে। অথচ, সে দেখতে পারল না। হেমলতা যেতে অনুমতি দেননি। পূর্ণা নামাযের দোয়ায় খুব অনুনয় করেছে আল্লাহকে। যেন লিখন শাহ আর চিত্রা দেবীকে স্বচক্ষে দেখতে পারে। আর এখন শুনলো, তাদের বাড়িতেই নাকি আসছে ওরা! পূর্ণার মনে হচ্ছে সে খুশিতে মরে যাচ্ছে।

____

‘এই মগা? আমাকে এক কাপ চা দাও তো।’

মগা ঝড়ের গতিতে চা নিয়ে আসে। লিখন চিত্রার পাশের চেয়ারটায় বসল। এরপর মগাকে বলল, ‘দারুণ চা করো তো তুমি।’

মগা কাচুমাচু হয়ে হাসল। ভাবে বোঝা গেল, প্রশংসা শুনে সে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। চিত্রা মগার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে উঠল। চিত্রা হাসলে মগা মুগ্ধ হয়ে দেখে। মাতব্বর বাড়ির কামলা সে। চিত্রনায়ক লিখন শাহ এবং চিত্র নায়িকা চিত্রা দেবীর সেবা করার দায়িত্ব মগাকে দেয়া হয়েছে। মগা এতে ভীষণ খুশি। চিত্রার সুন্দর মুখশ্রীর সামনে সবসময় থাকতে পারবে ভেবে। চিত্রা

বলল, ‘তোমার ভাইয়ের নাম জানি কী বলছিলে?’

চার ফুট উচ্চতার মগা উৎসাহ নিয়ে জবাব দিল, ‘মদন।’

চিত্রার হাসি পায়। অনেক কষ্টে চেপে রাখল। মগা,মদন কারো নাম হয়?

শুটিংয়ের মাঝে হুট করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। সবাই বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছে। হাতে সবার রং চা । ডিরেক্টর আবুল জাহেদ দারুণ খিচুড়ি রান্না করেন। বৃষ্টি দেখেই তিনি রান্নাঘরে ঢুকেছেন।

‘ আচ্ছা, মগা এই বাড়ির দুইটা মেয়ে কোথায়? আসার পর একবার এসেছিল। এরপর তো আর এলো না।’ চিত্রা প্রশ্ন করল। মগা বলল, ‘ওই যে লাহাড়ি ঘর। ওইডাত আছে।’

‘লাহাড়ি ঘর মানে কি?’

মগার বদলে লিখন বলল, ‘ যে ঘরের অর্ধেক জুড়ে ধান রাখা হয়। আর অর্ধেক জায়গায় চৌকি থাকে কামলাদের জন্য ওই ঘরকে লাহাড়ি ঘর বলে এখানে। বোঝা গেছে?

চিত্রা চমৎকার করে হাসল।

‘ বোঝা গেছে। মগা, বৃষ্টি কমলে লাহাড়ি ঘরে যাব। ঠিক আছে?’

‘আইচ্ছা আপা।’
‘এই লিখন যাবা? ওইতো সামনেই। আলসেমি করো না।’
মগা হৈহৈ করে উঠল, ‘না না, বেঠা লইয়া যাওন যাইত না। বাড়ির মালিকের মানা আছে। ‘
লিখন মগার না করার ভাব দেখে ভীষণ অবাক হলো। চিত্রা প্রশ্ন করল, ‘মানা কেন?’
‘বাড়ির বড় ছেড়িডারে তো আপনেরা দেহেন নাই। আগুন সুন্দরী। এই লিখন ভাইয়ের লাহান বিলাই চোখা। ছেড়িডারে স্কুল ছাড়া আর কোনোহানো যাইতে দেয় না। বাড়ি দিবার আগে কইয়া রাখছে লাহাড়ি ঘরে বেঠামানুষ

না যাইতে। এই ছেড়ি লইয়া বহুত্তা কিচ্ছা আছে।’

চিত্রা বেশ কৌতুহল বোধ করল। লিখন তীক্ষ্ণ ঘোলা চোখে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দেড় দিন হলো এখানে এসেছে। উঠানের শেষ মাথায় থাকা লাহাড়ি ঘরটা একবারো মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি।

সামনের দরজাটা বন্ধ। দুটো ছোট মেয়ে এসেছিল ঘরটার ডান পাশ দিয়ে। ঘরটার ডানে-বামে পিছনে গাছপালা। বাড়িটা পুরনো হলেও দারুণ। তবে এই মুহূর্তে তাঁর অন্যকিছুর প্রতি তীব্র কৌতূহল কাজ করছে।

চলবে....